HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০১ পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ০২: পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা
টপিক ০৩: পূর্ব বাংলার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা
টপিক ০৪: বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত
টপিক ০৫: ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার গণপরিষদঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
টপিক ০৬: আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা
টপিক ০৭: বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনঃ একুশে ফেব্রুয়ারির রাজপথে
টপিক ০৮: ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান
টপিক ০৯: নারী সমাজের ভূমিকা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১০: ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস
টপিক ১১: প্রথম শহিদ মিনার
টপিক ১২: প্রথম গান ও কবিতা
টপিক ১৩: বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন
টপিক ১৪: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৫: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

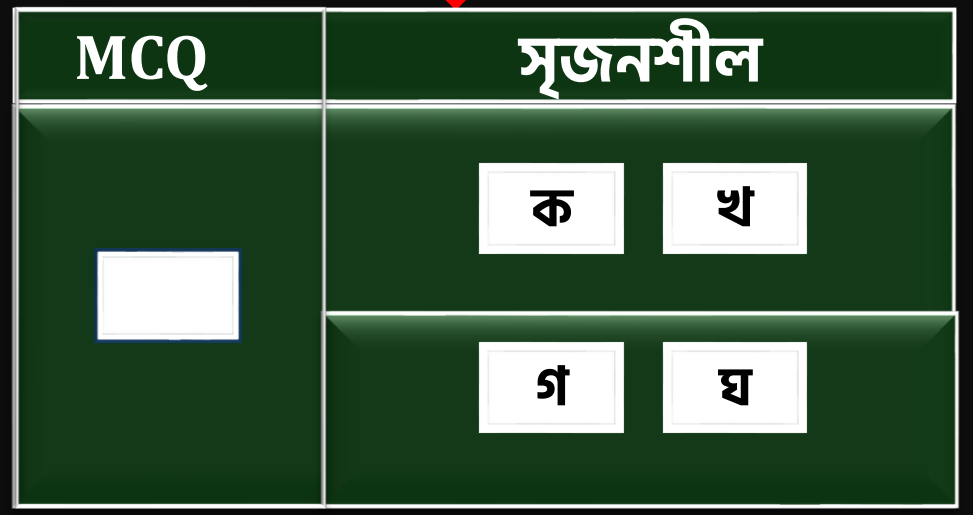

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম অনগ্রসর এলাকা ছিল বাংলা। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর রাজধানী দিল্লিকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনীতি আবর্তিত হতে থাকলে বাঙালি নেতৃবৃন্দ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কোণঠাসা হতে থাকে। এরপর 'বসু-সোহরাওয়াদী' প্রস্তাব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে উর্দুভাষী মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বাংলার মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দখল করে নেয়। ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাঙালি প্রগতিশীল অংশটি উপেক্ষিত হয়। বাঙালিদের মধ্যে যে অংশটি ক্ষমতার কাছাকাছি ছিল তারা ব্যক্তিস্বার্থে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি। এজন্য বাংলার অবহেলিত মানুষকে রক্তদানের মধ্য দিয়ে তাদের দাবি আদায় করতে হয়েছে।

একদিকে ব্রিটিশ শাসন, অপরদিকে হিন্দু জমিদার ও তাদের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচার- এ উভয় চাপে পিষ্ট হয়ে পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ মুক্তির পথ খুঁজতে থাকে। এ অবস্থায় জিন্নাহর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' তাদের সামনে আশার আলো দেখায়। ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দেয়। এ সময় বাংলার প্রগতিশীল হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব তুলে ধরেন। কিন্তু উগ্রসাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে সংক্রমিত হয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী কেউই অখণ্ড বাংলার দাবিকে সমর্থন দেননি। ফলে ভারত বিভক্তির সাথে সাথে বাংলাকে বিভক্ত করা হয়। বিভক্ত বাংলার পূর্ব অংশ 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন পাস করা হয়। এতে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পাশাপাশি পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারত স্বাধীনতা আইন পাস হলে ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট খাজা নাজিমউদ্দীন পূর্ব বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের এক সভায় ৭৫-৩৯ ভোটে সোহরাওয়ার্দীকে পরাজিত করে আইনসভায় সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন। এরপর ১৪ আগস্ট তার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের নিম্নরূপ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়-

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

ক্রম	নাম	পদবি
১	ফ্রেডারিক বার্ন	গভর্নর
২	খাজা নাজিমউদ্দীন	মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, পরিকল্পনা, বিচার ও রেজিস্ট্রেশন মন্ত্রণালয়
৩	নূরুল আমিন	মন্ত্রী, বেসামরিক সরবরাহ, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প দপ্তর মন্ত্রণালয়
৪	আবদুল হামিদ	মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫	সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল	মন্ত্রী, কৃষি, সমবায় ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৬	হাসান আলী	মন্ত্রী, যোগাযোগ, পূর্ত ও পানি মন্ত্রণালয়
৭	হামিদুল হক চৌধুরী	মন্ত্রী, রাজস্ব, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮	মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী	মন্ত্রী, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
৯	আবদুল করিম	স্পিকার
১০	নাজমুল হুদা	ডেপুটি স্পিকার

এখানে লক্ষণীয়, স্বাধীন পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দীসহ তার গ্রুপের কাউকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষকপ্রজা পার্টির কাউকেই নেয়া হয়নি। এ মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে অবাঙালি ও উর্দুভাষী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাটি ছিল নিম্নরূপ:

ক্রম	নাম	পদবি
১	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	গভর্নর জেনারেল
২	লিয়াকত আলী খান	প্রধানমন্ত্রী
৩	আই আই চুন্দ্রিগড়	মন্ত্রী, বাণিজ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪	গোলাম মোহাম্মদ	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
৫	সর্দার আবদুর রব নিশতার	মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৬	রাজা গজনফর আলী খান	মন্ত্রী, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৭	যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল	মন্ত্রী, আইন, শ্রম ও পূর্ত মন্ত্রণালয়
৮	ফজলুর রহমান	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৯	স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১০	মৌলভী তমিজউদ্দিন খান	স্পিকার

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

এখানে লক্ষণীয়, পাকিস্তানের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বাঙালি সদস্য ছিলেন মাত্র দু'জন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং মৌলভী তমিজউদ্দিন খান। এভাবে দেখা যাচ্ছে, নবগঠিত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক- উভয় সরকারেই প্রগতিশীল বাঙালি নেতৃবৃন্দ প্রত্যাখ্যাত হন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালিদের উপেক্ষাকরণ এবং পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকারে প্রগতিশীল নেতৃত্বকে স্থান না দেয়া ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি অবাঙালি নেতৃত্বের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই অংশ। এই পরিকল্পনাটি ছিল পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ বানিয়ে এর অধিবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাৎপদ করে জাতিগতভাবে পঙ্গু করে দেয়া এবং এর মাধ্যমে শোষণকে চিরস্থায়ী করা। এজন্য তারা শুরুতেই বাংলার প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করে; এরপর ভাষার ওপর আঘাত হানে। এক্ষেত্রে তারা খাজা নাজিমউদ্দীনের নেতৃত্বে প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালি গ্রুপটিকে ব্যবহার করে।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে এবং পূর্ব বাংলা এর একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালে মারি সম্মেলনের সমঝোতা অনুযায়ী ৮ সেপ্টেম্বর এর নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' রাখা হয়; যদিও তখন পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই নাম পরিবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করে যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন।

১৯৪৭ পরবর্তী ভারতবর্ষের মানচিত্র

১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট পাকিস্তান পার্লামেন্টে স্পিকারের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "Sir, you will see that they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'. We have demanded so many times that you should use 'Bengal'. The word 'Bengal' has a history, has a tradition of its own." (স্যার, দেখুন তাঁরা 'পূর্ব বাংলা'র পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' শব্দটি প্রতিস্থাপন করতে চায়। আমরা অসংখ্যবার দাবি করেছি যে, 'বাংলা' নামটি রাখা উচিত। কেননা, 'বাংলা' নামটির নিজস্ব ইতিহাস আছে, নিজস্ব ঐতিহ্য আছে)

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক ব্যবধান যেমন ছিল, তেমনি উভয় অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতিতেও যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। এ দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য ছিল। এ কারণে এ দু'অঞ্চলের মানুষ একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ববাংলা প্রদেশকে পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

যেমন- পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর রাজধানী করা হয় করাচি শহরকে। অথচ জনসংখ্যার অনুপাত বিবেচনা করলে বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলেই রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল। অর্থাৎ ঢাকাকে পাকিস্তানের রাজধানী করাই ছিল যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত। আবার লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার তা প্রদান করেনি। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকে। এ যুক্তি প্রদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিকে দমিয়ে রাখা। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগের তরুণ ও প্রগতিশীল অংশ বাধ্য হয়ে ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামক রাজনৈতিক দল গঠন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ ও বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো যখনই স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাত, তখনই তাদেরকে বিধর্মী, কাফের, ভারত-রাশিয়ার দালাল আখ্যা দেওয়া হতো। ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

পূর্ব বাংলা ছিল জনসংখ্যার দিক দিয়ে পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৬% এরও বেশি জনসংখ্যার বাস পূর্ব বাংলায়)। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকবর্গ কুক্ষিগত করে রাখে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ ২৩ বছরে, ১৯৪৭-৭১ সাল পর্যন্ত, পাকিস্তানের ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার এবং তিনি ছিলেন উর্দুভাষী। এ সময় ৭ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ৩ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার এবং তাদের মধ্যে ১ জন ছিলেন উর্দুভাষী। ১৯৪৭-৫৫ সালে পূর্ব বাংলার ৪ জন গভর্নরের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। এছাড়া জনসংখ্যার ভিত্তিতে ক্ষমতার বণ্টন পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূল হওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তান সংখ্যাসাম্য নীতি অনুসরণ করে 'এক ইউনিট তত্ত্ব' নামে এক অভিনব ধারণার সূত্রপাত করে। এতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি প্রদেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব ও সংখ্যালঘিষ্ঠ পশ্চিম অংশের ভোটের ভারসাম্য বজায় রাখা।

পাকিস্তানের রাজনীতি শুরু থেকেই বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। ফলে প্রথম থেকেই পাকিস্তানে শাসনের নামে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এজন্য দেখা যায়, যখনই পূর্ব পাকিস্তানের কোনো নেতা যেমন- খাজা নাজিমউদ্দীন বা মোহাম্মদ আলী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতেন তখনই পশ্চিম পাকিস্তানিরা কোনো না কোনো অজুহাতে তাদের পদচ্যুত করত। এছাড়া বাঙালিরা যখন প্রধানমন্ত্রী হতেন তখন রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা চলে যেত প্রেসিডেন্টের হাতে। আবার কোনো বাঙালি প্রেসিডেন্ট হলে রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতা চলে যেত প্রধানমন্ত্রীর হাতে।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তী গভর্নর জেনারেল হলেন বাঙালি রাজনীতিক খাজা নাজিমউদ্দীন। কিন্তু তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতা চলে গেল প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হাতে। আবার লিয়াকত আলী খান মৃত্যুবরণ করলে খাজা নাজিমউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হলেন। তখন আবার রাষ্ট্রের ক্ষমতা চলে গেল পাঞ্জাবি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের হাতে। সুতরাং খাজা নাজিমউদ্দীন বাঙালি হওয়ার কারণে গভর্নর জেনারেল হিসেবেও যেমন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন নি, তেমনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন নি। যদিও তিনি সব সময় অবাঙালি উর্দুভাষীদের অনুগত ছিলেন এবং এ আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে বাঙালি হয়েও ভাষা আন্দোলনে বাংলার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে এবং ব্যবসাক্ষেত্রে অবাঙালিদের প্রবল উপস্থিতিই এর প্রধান কারণ।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত ২৩ বছরে বাঙালি মাত্র তেরো মাস (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-অক্টোবর ১৯৫৭) পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তাও আবার পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান দলের সাথে কোয়ালিশন করে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই যখন সোহরাওয়ার্দী নিজ হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা নিতে চেষ্টা করেন তখনই পাকিস্তানি জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা তাকে বরখাস্ত করেন। এভাবে দেখা যায় নানারকম ছলচাতুরি করে জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের শাসনক্ষমতা দখল করে নেন এবং আমলানির্ভর রাজনীতির সুবাদে ১০ বছর ধরে পাকিস্তানে তার স্বৈরশাসন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের এই অনৈতিক ক্ষমতা দখলের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে চলে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল উচ্চপদে পশ্চিম পাকিস্তানিরাই অধিষ্ঠিত ছিল। মূলত পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করে আসছিল। অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রশাসনে বাঙালিদের এই অবহেলা যতই প্রকট হতে থাকে, ততই তাদের মধ্যে বঞ্চনার ক্ষোভ জমতে থাকে। এক পর্যায়ে তা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় রূপ নেয়।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন (পূর্ব পাকিস্তানে) যুক্ত পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ১৯৫১ সালে নির্বাচনের কথা থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন দিতে গড়িমসি করে। তাদের ধারণা ছিল, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ভয়াবহতা পূর্ব বাংলার নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। বস্তুত পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করতে থাকে। তাদের কার্যকলাপে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, পূর্ব বাংলার স্বার্থরক্ষা করতে তারা সম্পূর্ণ নারাজ। শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন দিতে আগ্রহ প্রকাশ না করলেও পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাপের মুখে অবশেষে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

যুক্তফ্রন্টের শরিক দলসমূহ: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকালীন পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনাও করত মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

যুক্তফ্রন্ট পাঁচটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যথা- ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. মাওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম পার্টি, ৪. হাজী দানেশের বামপন্থী-গণতন্ত্রী দল এবং ৫. আবুল হাশিমের খিলাফত-ই-রাব্বানি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা'।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি:

১. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, সব ধরনের মধ্যস্বত্ব ও সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল করা হবে।

৩. পাট ব্যবসায়কে জাতীয়করণ, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান এবং পাট কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৪. সমবায় কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন, কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।

৫. পূর্ব বাংলার লবণশিল্পের সম্প্রসারণ ও লবণ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

৬. বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা হবে।

৭. খাল খনন, সেচব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন এবং দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করা হবে।

৮. পূর্ব বাংলাকে শিল্পায়িত ও শ্রমিকের ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষা করা হবে।

৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে। শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হবে।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

১০. বাংলাকে শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ও সব ধরনের কালাকানুন বাতিল করা হবে।
১২. প্রশাসনকি ব্যয় সংকোচন, উচ্চ ও নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য হ্রাস করা হবে।
১৩. সব ধরনের দুর্নীতি নির্মূল করা হবে।
১৪. রাজবন্দিদের মুক্তিদান, বাকস্বাধীনতা, সভা-সমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হবে।
১৬. 'বর্ধমান হাউস'-কে আপাতত ছাত্রাবাস এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে।
১৭. বাংলা ভাষার শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হবে।
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।
১৯. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
২০. নিয়মিত ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।
২১. পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

নির্বাচনের ফলাফল: ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রথম সাধারণ নির্বাচন। এ নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট প্রদান করেন। ১৯৫৪ সালের ২ এপ্রিল সরকারিভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট আসন ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য ৭২টি আসন সংরক্ষিত ছিল। নির্বাচনের ফলাফল ছিল নিম্নরূপ-

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

রাজনৈতিক দল	মুসলিম আসন	অমুসলিম আসন
যুক্তফ্রন্ট	২২৩	১৩
মুসলিম লীগ	৯	০
খিলাফত-ই-রাব্বানি	১	০
কংগ্রেস	০	২৪
তফসিলী ফেডারেশন	০	২৭
খ্রিষ্টান সম্প্রদায়	০	১
বৌদ্ধ সম্প্রদায়	০	২
কমিউনিস্ট পার্টি	০	৪
স্বতন্ত্র	৪	১

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, যুক্তফ্রন্ট ৩০৯টি আসনের মধ্যে ২২৩টি মুসলিম আসন লাভ করে। এর মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনও ছিল। যুক্তফ্রন্টের ২২৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ৪৬, নেজামে ইসলামি পার্টি ২১ এবং গণতন্ত্রী দল পায় ১৩টি আসন। অন্যদিকে ১৯৩৭ সাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় আসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। অমুসলিম আসনে কংগ্রেস লাভ করে ২৫টি, তফসিলী ফেডারেশন ২৭টি এবং সংখ্যালঘুদের যুক্তফ্রন্ট পায় ১৩টি আসন। এ নির্বাচনে মুসলিম ও অমুসলিম আসন মিলিয়ে ৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীও নির্বাচিত হয়েছিলেন। চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায়, যুক্তফ্রন্ট মুসলিম ও অমুসলিম আসন মিলিয়ে মোট ২৩৬টি আসনে জয়লাভ করে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

নির্বাচনের গুরুত্ব: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিজয়ের ফলে মুসলিম লীগের সুদীর্ঘ সাত বছরের কুশাসন, শোষণ ও অত্যাচারের সাময়িক অবসান ঘটে। পূর্ব বাংলার জনগণের কাছে এ নির্বাচন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কবল হতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় বলে পরিগণিত হয়। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর বাঙালিরা মনে করেছিল যে, এখন আর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। বাঙালিরা তখন থেকেই আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং স্বশাসন দাবি করে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছেই মুসলিম লীগের বড় বড় নেতাদের পরাজয় ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে তরুণ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ (পরবর্তীকালে মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী) সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নানকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে এমএলএ নির্বাচিত হন। নির্বাচনে তাজউদ্দিন আহমদ ১৯,০৩৯ এবং ফকির আবদুল মান্নান ৫,৯৭২ ভোট পান।

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তাঁরা বুঝতে পারে, পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ববাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০২ পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

টপিক ০২: পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ছিল খুব দরিদ্র। একটি কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ আর্থিক কাঠামোর মধ্যেই দীর্ঘদিন থেকে তাদের বসবাস। কলকাতাকেন্দ্রিক জমিদার এবং তাদের নায়েব-গোমস্তাদের দ্বারা তারা শোষিত হয়েছিল যুগের পর যুগ। শিক্ষার হার কম হওয়ায় এখানে তখনও পর্যন্ত কোনো শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তারা যোগ দিয়েছিল এই কারণে যে, তারা মনে করেছিল পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে তাদের এই আর্থিক দৈন্যদশার মুক্তি আসবে। অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে সচ্ছল। ফলে দেখা যায় পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকেই এর দুই অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক অসমতা বিরাজ করছিল। এই অসমতা দূর করার জন্য পাকিস্তান সরকারের উচিত ছিল উভয় অংশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ন্যায়ভিত্তিক আর্থিক কর্মসূচি প্রণয়ন। কিন্তু তারা তা করেনি। মেরামত

পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তার ৯০% ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৪৭-৬৬ পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই অসমতা দিন দিন বেড়েছে। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যকার অসমতার পেছনে কারণটি ছিল পরিকল্পিত। পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ বানিয়ে শোষণ করাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের অন্যতম লক্ষ্য। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল বিশেষত আইয়ুব খানের শাসনামলে তা প্রকট আকার ধারণ করে। পাঞ্জাবিদের নিয়ন্ত্রণাধীন বৈদেশিক সাহায্যের সিংহভাগই তাদের নিজ নিজ অঞ্চলের উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হয়। নিচের ছক থেকে দেখা যায় ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ঠকানো হয়েছে।

পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

পাকিস্তানে বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যবহার (১৯৪৭-১৯৭০) (মিলিয়ন ডলারে)

প্রকার	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	কেন্দ্র	মোট
প্রকল্প ঋণ	৪১৭	৬০৮	১০৮	১১৩৩
প্রকল্প বহির্ভূত ঋণ	৪০৮	৬৭৩	৫৩	১১৩৪
পি এল ৪৮০ খাদ্য	৪৪৫	৭৯১	৫	১২৪১
গ্যারান্টিকৃত ঋণ	৩৫২	৬২৩	১১	৯৮৬
প্রকল্প অনুদান ও প্রযুক্তিগত সাহায্য	৫৬	১৪০	২০০	৩৯৬
পণ্যদ্রব্য অনুদান	২৬৩	৫৭৫	১৫	৮৫৩
সিন্ধু অববাহিকা তহবিল	০০	৭৫৬	০০	৭৫৬
মোট	১৯৪১	৪১৬৬	৩৯২	৬৪৯৯

উপরের ছকে কেন্দ্রের কলামে যে অর্থের উল্লেখ আছে তাও প্রকৃতপক্ষে প্রতিরক্ষা খাতের অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যয় হতো।

পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

আমদানি-রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বৈষম্য (Import-Export & Internal Trade Disparity): পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের মোট আমদানির বৃহত্তর অংশ পেত পশ্চিম পাকিস্তান এবং ক্ষুদ্রতর অংশ আসত পূর্ব পাকিস্তানে। মূলত, আমদানিজনিত বাণিজ্য, পণ্যভোগ ও উন্নয়ন সহায়তা প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানই ভোগ করত। প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই অসমতা বিরাজ করছিল, যা আইয়ুব খানের শাসন আমলের শেষের দিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রপ্তানি-আমদানি খাতে আয় এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ: ১৯৫১-১৯৬৭

বছর	রপ্তানি				আমদানি			
	পাকিস্তান (মিলিয়ন রুপিতে)	পশ্চিম পাকিস্তান (মিলিয়ন রুপিতে)	পূর্ব পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের অংশ (%)	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের অংশ (%)
১৯৫১-৫২	২০০৯	৯২২	১০৮৭	৫৪.১১%	২২৩৭	১৪৭৪	৭৬৩	৩৪.১১
১৯৫৫-৫৬	১৭৮৩	৭৪২	১০৪১	৫৮.৩৮%	১৩২৫	৯৬৪	৩৬১	২৭.২৫
১৯৫৯-৬০	১৮৪৩	৭৬৩	১০৮০	৫৮.৬০%	২৫১৫	১৮৬০	৬৫৫	২৬.০৪
১৯৬৩-৬৪	২৩০৯	১০৭৫	১২২৮	৫৩.৩২%	৪৪৩০	২৯৮১	১৪৪৯	৩২.৭১
১৯৬৭-৬৮	৩৩৪৮	১৮৬৪	১৪৮৪	৪৪.৩২%	৪৬৫৪	৩৩২৭	১৩২৭	২৮.৫১
১৯৪৭-৭০	৪৬,৬৯৬	২১,১৩৭	২৫,৫৫৯	৫৪,৭৩%	৬৪,৩৯২	৪৫,৩২৫	২০,০৬৭	৩১.১৬

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০৩ পূর্ব বাংলার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা

টপিক ০৩: পূর্ব বাংলার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পূর্ব বাংলার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা

পাকিস্তানের জন্মলগ্নে যে সুশৃঙ্খল আমলাতন্ত্র লাভ করে তাতে বাঙালির উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য। ব্রিটিশ আমলে এই আমলাগোষ্ঠীই ছিল শাসনের কেন্দ্রবিন্দু। পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই এরা পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকি করে এই আমলাতন্ত্র। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, একটি অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হওয়ায় শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা প্রশাসনে তার নিয়ন্ত্রণ হারায়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ এ অনগ্রসরতা দূর করার কোনো উদ্যোগ তো নেয়নি বরং বাঙালিদের আরও পশ্চাৎপদ পরিস্থিতিতে ফেলার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ১৯৪৭সালে যে ১৫ জন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস সদস্যকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে আত্মীকরণ করা হয় তার মাত্র ৪ জন ছিল বাঙালি। তাছাড়া করাচিতে রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা একচেটিয়া সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

পূর্ব বাংলার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে সেখানে গিয়ে অবস্থান করে অতঃপর পরীক্ষা দিয়ে চাকরি গ্রহণ করা বাঙালিদের জন্য ছিল নিতান্ত কঠিন। ঢাকায় এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় বাঙালিরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে। তাছাড়া ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি না দেয়ায় এ বছরগুলোতে বাঙালিরা কোনো সরকারি চাকরিতে সুবিধা করতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে ৪২,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৯০০-জন এবং এর অধিকাংশই ছিল নিম্নপদের। ১৯৫৫-৬৫ সময়কালে পাকিস্তানের স্টেট ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব,

পূর্ব বাংলার শাসনতান্ত্রিক অবস্থা

এয়ারলাইন্সের সচিবসহ সকল সেক্রেটারিয়েট পদে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এসব পদে কোনো বাঙালি কর্মকর্তা ছিল না। ১৯৫৮-৬৮ সময়কালে অর্থাৎ সামরিক শাসনের ৪৪ মাসে যে ৭৯০ জন জুনিয়র গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ করা হয় তার মধ্যে মাত্র ১২০ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। ১৯৬০-৬৩ সময়কালে ১৪ জন সামরিক কর্মকর্তাকে বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়। এরা সকলেই ছিলেন অবাঙালি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী চার বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র ৮১৮ জনকে প্রতিরক্ষা বিভাগে নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ এ সময়কালে হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া সামরিক বিভাগে নিয়োগ দেয়া হলে বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানের দূর-দূরান্তে পোস্টিং দেয়া হতো। ফলে সহসা কোনো মেধাবী ছাত্র আর্মিতে যেতে আগ্রহী হতো না। এভাবে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০৪ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

টপিক ০৪: বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সাল থেকেই। ১৯৪৭ সালের ১৮ মে মজলিসে-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের উদ্যোগে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত 'উর্দু সম্মেলনে' যুক্ত প্রদেশ মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। এ বছরই জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করেন। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রতিবাদমুখ হয়ে ওঠে। এর প্রতিবাদে ভাষাতাত্ত্বিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে এক প্রবন্ধ লিখে ড. জিয়াউদ্দীনের সেসব বক্তব্য খণ্ডন করেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার প্রবন্ধে বলেন, "যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার কোনো যুক্তি নাই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোনো দ্বিতীয় ভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবেই উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা উচিত।"

বিভিন্ন সময় মুসলিম লীগের অবাঙালি নেতৃত্ব ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণি যে উর্দুকে নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করেছিল তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আর সে সম্পর্কে ভারত বিভক্তির পূর্বেই তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ও তার অনুসারীগণ বাঙালিদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের অধ্যাপকদ্বয় যথাক্রমে আবুল কাশেম ও নুরুল হক ভূঁইয়া বুদ্ধিজীবীদের অসন্তোষকে সাংগঠনিক রূপদানের প্রচেষ্টায় ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' গঠন করেন। এ সংগঠন থেকে ১৯৪৭সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কাশেমের তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা: বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। পুস্তিকাটিতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানানো হয়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

১৯৪৭ সালের শেষদিকে আবুল কালাম শামসুদ্দীন, ড. এনামুল হক
প্রমুখ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো দাবি নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত সরকারি শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে এর প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৬ ডিসেম্বর তমদ্দুন মজলিসের সেক্রেটারি অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ডিসেম্বর মাসেই 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ সংগঠনের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মিছিল, সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারিসহ সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০৫ ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার গণপরিষদঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

টপিক ০৫: ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার গণপরিষদঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার গণপরিষদঃ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এক উজ্জ্বল নাম। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার পক্ষে লড়াইয়ের সূত্রপাত করেন। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের জন্য তিনি একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাকে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে উল্লেখ করে এটিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবি করেন।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সরকারি কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করার সিদ্ধান্তেরও প্রতিবাদ জানান। সংসদ সদস্য প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। তারা ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য। সুতরাং তাদের এ সমর্থনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনমতের স্বাভাবিক প্রতিফলন ঘটেছিল।

তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে পরিষদের মুসলমান সদস্যরা (যারা ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয়) একযোগে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। খাজা নাজিমউদ্দীন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ চায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু হোক।' প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবটিকে পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। উর্দুকে লক্ষ কোটি মুসলমানের ভাষা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবল উর্দুই হতে পারে।' অনেক বিতর্কের পর সংশোধনীটি ভোটে বাতিল হয়ে যায়। সংসদীয় দলের আপত্তির কারণে অনেক বাঙালি মুসলমান সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্থাপিত সংশোধনীটিকে সমর্থন করতে পারেননি।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০৬ আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

টপিক ০৬: আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। এর ১ম পর্যায় হচ্ছে ১৯৪৭-৪৮ সাল। এ সময় ভাষার প্রশ্ন আর বিতর্কের মধ্যে না থেকে তা প্রতিবাদ বিক্ষোভে পরিণত হয়। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা আগমন এবং ভাষার প্রশ্নে তার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ ছিল এ পর্যায়ের মুখ্য ঘটনা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে পাকিস্তানের নতুন রাজধানী করাচিতে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সংবাদ ঢাকায় এসে পৌঁছলে পূর্ব বাংলার ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এ পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং গণপরিষদে নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব বাংলায় হরতাল পালিত হয়, চলে গ্রেফতার-নির্যাতন।

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঐ দিন ছাত্ররা ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় মিছিল বের করে। পরে আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ছাত্ররা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বক্তৃতা করেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, রনেশ দাশ গুপ্ত এবং অজিত গুহ। ১১ মার্চ ঢাকায় বিক্ষোভ ও ধর্মঘট এবং ১৩ মার্চ ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালিত হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আন্দোলন দমাতে তারা গ্রহণ করে নানা রকম নিপীড়নমূলক তৎপরতা। বেশ কিছু ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে শওকত আলী, কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

এ পরিস্থিতিতে ১৫ মার্চ পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে খাজা নাজিমউদ্দীন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য গণপরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়া বন্দিদের মুক্তি, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবী মেনে নেয়া হয়।

মূলত এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, পূর্ব বাংলার এ উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা এবং গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরকে নির্বিঘ্ন করা। পরবর্তীতে নাজিমুদ্দিন এ সকল চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করেন।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা সফরে আসেন এবং ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন- Urdu and only Urdu shall be the State language of Pakistan. (উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা) সাথে সাথে উভয় স্থান থেকেই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে এবং 'না' 'না' প্রতিধ্বনি হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০৭ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনঃ একুশে ফেব্রুয়ারির রাজপথে গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

টপিক ০৭: বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনঃ একুশে ফেব্রুয়ারির রাজপথে গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা ছিল বাংলা। উর্দু কোনো প্রদেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা ছিল না। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে কোনো যুক্তিতেই উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু জিন্নাহর জীবদ্দশায় বাংলাকে উপেক্ষা করা হয়।

ভাষা	শতকরা হার
বাংলা	৫৬.৪০%
পাঞ্জাবি	২৮.৫৫%
পশতু	৫.৪৭.%
উর্দু	৩.২৭%
বেলুচি	১.২৯%
ইংরেজি	০.০২%
অন্যান্য	৫%

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু হলে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। এ সময় পূর্ব বাংলার জনগণ আশা করেছিল এবার হয়তো বাংলা ভাষার স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। কিন্তু তিনি ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য হয়েও বাঙালির স্বার্থ কখনও দেখেননি। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের মৌলিক বিষয় নিয়ে রিপোর্ট তৈরির উদ্দেশ্যে ২৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা 'মূলনীতি কমিটি' নামে পরিচিত ছিল। মৌলভী তমিজউদ্দিন খান এর সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৫০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান গণপরিষদে মূলনীতি কমিটির প্রথম বা অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। এখানেও তিনি উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে গণপরিষদে লিয়াকত আলী খানের রিপোর্টের ওপর আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর ঢাকায় আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে একটি মহাজাতীয় সম্মেলন বা গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। এ সময় পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করার আর একটি চক্রান্ত করে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রবর্তনের মাধ্যমে। এতে পূর্ব বাংলার জনগণ কিছুটা আশান্বিত হয়।১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যু হলে খাজা নাজিমউদ্দীন গভর্নর জেনারেল পদ ছেড়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ছাত্র সমাজের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি আবারো উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে জমায়েত

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

৪ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে ঠিক করা হয় যে, ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি 'পতাকা দিবস' পালন করা হবে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতা প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে গিয়ে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করবে। এদিকে ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাগারে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। এ বিষয়ে আলোচনার দাবি পেশ করে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে মিসেস আনোয়ারা খাতুন এক মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

তৎকালীন সরকার ১৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদকে অনশনরত অবস্থায় ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করে। আন্দোলন দাবানলের মতো সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন এবং সকল প্রকার শোভাযাত্রা, মিছিল ও সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখ থেকে ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে গুলিবর্ষণ করে। এতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং শ্রমিক আউয়ালসহ কয়েকজন। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে সম্মত হয় এবং ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে তা স্বীকৃতি দেয়।

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

বাংলা শুধু পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা ছিল না। বাংলা ছিল সমগ্র পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। হিসাব অনুসারে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। সেক্ষেত্রে বাঙালিরা বাংলাকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করতে পারত। কিন্তু তারা তা করেনি। অথচ পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী মাত্র ৩.২৭% মানুষের ভাষা উর্দু হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছিল- যা ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অনৈতিক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০৮ ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

টপিক ০৮: ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

This Topic is important for

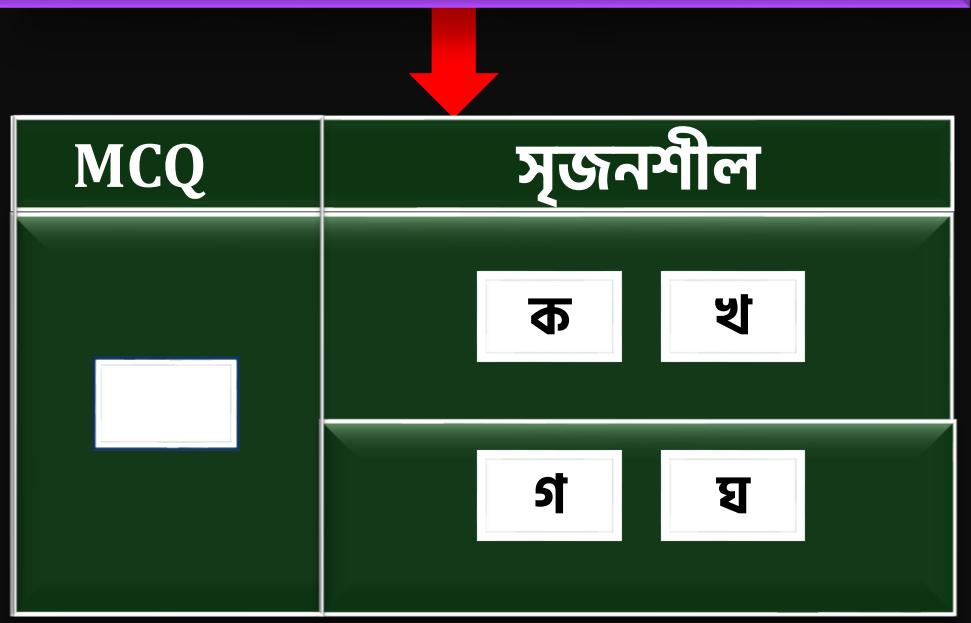

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

শহিদ রফিকউদ্দিন (৩০ অক্টোবর, ১৯২৬- ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)
শহিদ রফিকউদ্দিন মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলার পারিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ। তার পিতার নাম আবদুল লতিফ ও মাতার নাম রাফিজা খাতুন। তার পিতা আবদুল লফিত ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি কলকাতায় ব্যবসা করতেন। ১৯৪৭সালে দেশভাগের পর রফিকউদ্দিনের পিতা ঢাকায়, চলে আসেন। তিনি এখানে বাবুবাজারে আকমল খাঁ রোডে পারিল প্রিন্টিং প্রেস নামে ছাপাখানা চালু করেন। রফিকউদ্দিনের শৈশবের পড়ালেখা শুরু কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউটে। এরপরে তিনি ভর্তি হন মানিকগঞ্জের বায়রা স্কুলে। বায়রা স্কুল থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিক পাস করে রফিকউদ্দিন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্রনাথ কলেজে বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন। আই.কম. ক্লাস পর্যন্ত পড়লেও পরে পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি ঢাকায় এসে পিতার সঙ্গে প্রেস পরিচালনা করতে শুরু করেন। পরে আবার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন।

রফিক উদ্দিন

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

ঘটনার সময় শহিদ রফিকের বয়স ছিল ২৬ বছর। পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাসের কারণে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে আশ্রয় নেওয়ার সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন রফিক। গুলিতে তার মাথার খুলি উড়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখনই মারা যান তিনি। মেডিকেল হোস্টেলে ১৭ নম্বর রুমের পূর্ব দিকে তার লাশ পড়েছিল। ছয়-সাত জন ধরাধরি করে তার লাশ এনাটমি হলের পেছনের বারান্দায় এনে রাখেন। মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগের জন্য সরকার ২০০০ সালে তাঁকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে। এছাড়াও তাঁর গ্রামের নাম পরিবর্তন করে রফিক নগর রাখা হয়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভবনের নামকরণ করা হয়- 'ভাষা শহিদ রফিক ভবন'।

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

শহিদ আবুল বরকত (১৬ জুন, ১৯২৭ - ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)

শহিদ আবুল বরকত মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বাবলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম শহিদ। আবুল বরকতের পিতার নাম মরহুম শামসুজ্জোহা, মাতার নাম হাসিনা বিবি।

শহিদ বরকত ভরতপুরের তালিবপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক এবং বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে আইএ পাস করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সালে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে চতুর্থ হয়ে বিএ অনার্স পাস করেন। এরপর স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙে বিক্ষোভকারী ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ গুলি চালালে হোস্টেলের বারান্দায় গুলিবিদ্ধ হন আবুল বরকত। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ভর্তি অবস্থায় রাত ৮টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল বরকত

আটচল্লিশের রাজপথঃ গণমানুষ ও ছাত্রসমাজের ভূমিকা

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালের রাতে আবুল বরকতের আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে আজিমপুর গোরস্তানে তার লাশ দাফন করা হয়। মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মত্যাগের জন্য ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে।

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

শহিদ শফিউর রহমান (২৪ জানুয়ারি, ১৯১৮- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)
শফিউর রহমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাহবুবুর রহমান ছিলেন ঢাকার পোস্ট এন্ড টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট।
কলকাতা গভর্নমেন্ট কমার্সিয়াল কলেজ হতে আইকম পাস করে শফিউর রহমান চব্বিশপরগনা সিভিল সাপ্লাই অফিসে কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৫২-এর ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নওয়াবপুর রোডে ২১ ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ পুনরায়, গুলিবর্ষণ করে। পুলিশের গুলি শফিউর রহমানের পিঠে এসে লাগে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচার সফল না হওয়ায় ঐদিন সন্ধ্যা ৭টায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ২২ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

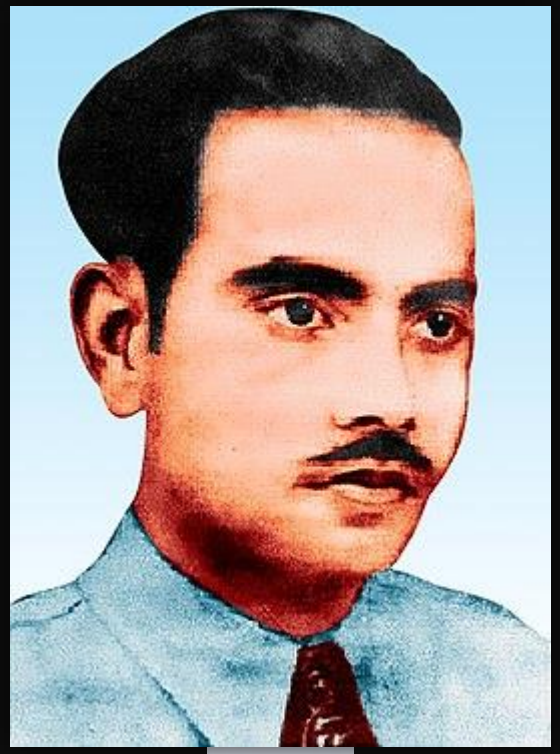

শফিউর রহমান

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

শহিদ আবদুল জব্বার (১১ অক্টোবর, ১৯১৯/২৬ আশ্বিন, ১৩২৬ – ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২) শহিদ আবদুল জব্বার ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় ধোপাঘাট কৃষ্টবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়নের পরে দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া ত্যাগ করে পিতাকে কৃষিকাজে সাহায্য করেন। এরপর পনেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। নারায়ণগঞ্জে এসে জাহাজঘাটে এক ইংরেজ সাহেবের সান্নিধ্যে আসেন। সাহেব তাকে একটি চাকরি দিয়ে বার্মায় পাঠান। সেখানে তিনি দশ-বারো বছর অবস্থান করেন। তারপর দেশে ফিরে আসেন। ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এসে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রদের আবাসস্থল (ছাত্র ব্যারাক) গফরগাঁও নিবাসী হুরমত আলীর রুমে ওঠেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্রদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে আবদুল জব্বার আহত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সরকার তাকে ২০০০ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে।

আবদুল জব্বার

ভাষা আন্দোলনে শহিদদের পরিচয় ও অবদান

শহিদ আবদুস সালাম (২৭ নভেম্বর ১৯২৫- ৭ এপ্রিল, ১৯৫২)
আবদুস সালাম ফেনীর দাগনভূঁইয়া উপজেলার লক্ষ্মণপুর (বর্তমান সালামনগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুনশি আবদুল ফাজিল মিয়া। আবদুস সালাম কর্মজীবনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের 'ডিক্টেরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ' বিভাগের পিয়ন হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকার নীলক্ষেত ব্যারাকের ৩৬ বি নং কোয়ার্টারে বাস করতেন। তিনি বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বায়ান্নর ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখের রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙে বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালালে আবদুস সালাম গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। দেড় মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ৭ এপ্রিল, ১৯৫২ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০০ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে।

আবদুস সালাম

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ০৯ নারী সমাজের ভূমিকা

টপিক ০৯: নারী সমাজের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নারী সমাজের ভূমিকা

১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকাও কম নয়। বিশেষ করে সেকালের রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তারা যেভাবে মিছিল-সমাবেশ করেছিলেন তা ওই নারীদের অসাধারণ দেশপ্রেম ও সাহসের পরিচয় বহন করে। ভাষা আন্দোলনের সময় নারীরা শুধু মিছিলেই যোগ দেননি, আহত ছাত্রদের চিকিৎসার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন, ছাত্রদের পুলিশি গ্রেপ্তার-নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে তাদের নিজেদের বাসা-বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন। কেউবা কারাগারে বন্দি ছাত্রদের জন্য খাবার সংগ্রহ করেছেন। শহিদ মিনার গড়ার জন্য প্রায় সারারাত ধরে ইট বহন করেছিলেন মেয়েরা। চলল চসহজীক

২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে নারীদের মিছিল

নারী সমাজের ভূমিকা

নিচে ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা পালনকারী কয়েকজন মহীয়সী নারীর পরিচয় তুলে ধরা হলো:

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন এদেশের নারী আন্দোলনের অগ্রপথিক কবি বেগম সুফিয়া কামাল। আন্দোলনের অনেক কর্মীর সঙ্গে তার ছিল নিবিড় যোগাযোগ। মুনীর চৌধুরীর বোন 'ভাষাকন্যা' নাদেরা বেগম পুলিশের ঘেরাও থেকে আত্মগোপন করে সুফিয়া কামালের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেন। নাদেরা সেখানে ছিলেন সুফিয়া কামালের ভাগ্নি পরিচয়ে। এ জন্য তার ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল জাহানারা। কিছুদিন পর ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে পুলিশ নাদেরাকে বন্দি করে। কারাগারে অন্য রাজবন্দিদের সঙ্গে তিনি কঠোর নির্যাতনের শিকার হন।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিন ড. সুফিয়া আহমদের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল আনন্দময়ী ও বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের মেয়েদের জড়ো করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় নিয়ে আসার। তিনি এ কাজটি সেদিন ঠিকমতোই করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ছেলেরা দশ জন করে এবং মেয়েরা চারজন করে বের হয়ে পুলিশের ব্যারিকেড পার হয়ে এগিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে ছাত্রদের দুটি দল মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ট্রাকে তোলে। তৃতীয় দল নিয়ে বের হয় মেয়েরা। কিছুদূর যাওয়ার পর শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ। সেদিন সুফিয়া আহমদ কিছুটা আহত হয়েছিলেন।

নারী সমাজের ভূমিকা

মেডিকেল ছাত্রী হালিমা খাতুন ছিলেন ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখা আরেক মহীয়সী নারী। তার ওপর মুসলিম গার্লস স্কুল থেকে মেয়েদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আসার দায়িত্ব ছিল। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভাঙতে আসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে তার দলই ছিল মেয়েদের প্রথম দল। পুলিশ পথ আটকালে তারা পুলিশের রাইফেল ঠেলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যান। পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। অকুতোভয় ওই মেয়েরা দমে না গিয়ে ঢাকা

মেডিকেলের জরুরি বিভাগ থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে আসেন এবং গণপরিষদ ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। কিন্তু তারা কিছুদূর না যেতেই শুরু হয় পুলিশের গুলিবর্ষণ। গুলিতে রফিক উদ্দিনের (শহিদ রফিক) মাথার খুলি উড়ে গেলে হালিমা খাতুন ও কাজী ইদ্রিসের সহযোগিতায় আমানুল হক সে ছবি তোলেন। সেদিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেবিকারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আহতদের সেবা দেন।

নারী সমাজের ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনকর্মী রওশন আরা বাচ্চু পুলিশের লাঠিপেটায় আহত হয়েছিলেন। ছাত্রদের দুটো দল পুলিশের ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার পর রওশন আরা বাচ্চু অন্যদের নিয়ে এগিয়ে যান। তখন পুলিশের লাঠিচার্জের মধ্যে পড়েন তারা। রওশন আরা পুলিশের এলোপাতাড়ি লাঠিপেটায় আঘাত পান। পরে পুলিশ গুলি শুরু করলে তিনি রাস্তার পাশের একটি রিকশার গ্যারেজে লকিয়ে থাকেন। অনেকক্ষণ সেখানে থেকে সন্ধ্যায় হোস্টেলে ফিরে যান।

নারী সমাজের ভূমিকা

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকার বাইরের যে নারীদের ভূমিকার কথা জানা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মমতাজ বেগম। ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের ৩০০ ছাত্রী নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি মিছিল বের করেছিলেন স্কুলটির প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম। মমতাজ বেগম একপর্যায়ে কারাবরণও করেন। তিনি মুচলেকা দিয়ে কারাগার থেকে মুক্তিলাভে অস্বীকৃতি জানান। এ জন্য স্বামী তাঁকে তালাকও দেন। মমতাজ বেগমের ছাত্রী ইলা বকশী ও বেনু ধরও কারাবন্দি হন। অন্যদিকে খুলনার স্কুলছাত্রী হামিদা খাতুন নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন।

ভাষা আন্দোলনে আরো যেসব নারীর ভূমিকা ছিল তাদের অন্যতম সিলেটের যোবেদা খাতুন চৌধুরী। তাকে সহযোগিতা করেছিলেন শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা, সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন প্রমুখ। সিলেটের ছাত্রী সালেহাকে স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য তিন বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ১০ ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

টপিক ১০: ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এটিই বাঙালিদের প্রথম সার্থক আন্দোলন যাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে। এজন্য ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাসের অনুসন্ধান জরুরি। নিচে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি উল্লেখ করা হলো:

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

চট্রগ্রাম

১৯৪৮ সালের ১২ মার্চ মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে সেখানে মাতৃভাষা বাংলার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। এর প্রতিবাদে নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন চট্টগ্রাম শাখার নেতৃবৃন্দ এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, আহমেদ সাগীর চৌধুরী, রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী, মহিবুবুল আলম চৌধুরী, মাহবুবুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকে রফিক উদ্দিন সিদ্দিকীকে আহ্বায়ক এবং মাহবুবুল আলম চৌধুরী ও রেল শ্রমিক নেতা মাহবুবুল হককে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি লালদীঘি ময়দানে এক জনসভা আয়োজন করে। জনসভা শেষে চট্টগ্রাম অঞ্চলের গণপরিষদ নেতা এ. কে. খান ও নূর আহমদ চেয়ারম্যানের বাড়ি ঘেরাও করা হয়। মূলনীতিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন ও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হলে পদত্যাগ করবেন-মর্মে অঙ্গীকার করলে তাদের বাড়ি ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে বাঙালিরা 'না না' প্রতিধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের নুরুল ইসলাম ছিলেন। এসময় জিন্নাহ চট্টগ্রাম সফর করেন এবং চট্টগ্রামের ছাত্রদের সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেন।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

চট্রগ্রাম

দামপাড়া পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত জনসভায় জিন্নাহ ছাত্র নেতৃবৃন্দকে লিখিতভাবে তাদের দাবি পেশ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু কোনো লিখিত প্রস্তাব প্রস্তুত না থাকায় কোনো প্রস্তাব দেয়া যায়নি। ১৯৫০ সাল থেকে চট্টগ্রামের ছাত্ররা ভাষার প্রশ্নে একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পুনরায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিলে ৪ ফেব্রুয়ারি, 'চট্টগ্রাম জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি অন্যান্য জেলার মতোই চট্টগ্রামে হরতাল, মিছিল-মিটিং পালিত হয়। মাহবুব উল আলম চৌধুরী অসুস্থ অবস্থায় 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' নামে অমর কবিতাটি রচনা করেন। 'কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস' থেকে এ কবিতাটি প্রকাশের সাথে সাথে পুলিশ প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করে এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরী, চৌধুরী হারুন অর রশিদ এবং আকমল আহমেদের নামে মামলা হয় এবং গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হয়। তাদের মালামাল ক্রোকের নির্দেশ আসে। কবিতাটি নিষিদ্ধ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

রাজশাহী

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই রাজশাহীতে ভাষার প্রশ্নটি জনগণের সামনে চলে আসে। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাকে পরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ঐদিনই শহরের ভুবন মোহন পার্কে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সভা থেকে বহু ছাত্রের স্বাক্ষর যুক্ত একটি স্মারকলিপি পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১ মার্চ এবং ১১ মার্চ হরতাল পালিত হয়। হরতালের সমর্থনে ছাত্রদের মিছিলে মুসলিম লীগের ভাড়াটে গুন্ডারা হামলা চালায়। এ সময় রাজশাহী কলেজ ছিল সকল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। মুহম্মদ আবদুল হাই, ডা. এনামুল হক, ড. গোলাম মকসুদ হিলালী আন্দোলনকারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে কাশেম চৌধুরী, গোলাম রহমান, গোলাম তওয়াব, একরামুল হক, নূরুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান শেলী, কাসিম উদ্দিন আহমেদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তী পর্যায়ে এদের অনেককেই গ্রেফতার করলে কিংবা ঢাকা চলে গেলে এস এ বারী, গোলাম আরিফ টিপু, আহমদুল্লাহ চৌধুরী, আবুল কালাম চৌধুরী, এস এম এ গাফফার, মহসীন প্রামাণিক, হাবিবুর রহমান প্রমুখ নেতৃত্বে আসেন।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

রাজশাহী

১৯৪৯-৫১ পর্যন্ত সময় ভাষার প্রশ্নে আন্দোলন আরও তীব্র হয়। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস ও ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিসের ঢাকার নেতৃবৃন্দ রাজশাহীর ভুবন মোহন পার্কে এক জনসভা করেন। এ সভায় রাজশাহীর পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে বিপুল লোক সমাগম হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি দিনভর হরতাল চলে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। ভুবন মোহন পার্কে সভা হয়। সভা চলাকালে খবর আসে যে ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলি হয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র হত্যার সংবাদ ঐদিন সন্ধ্যায় রাজশাহী এসে পৌঁছলে সচেতন ছাত্ররা একে এক রাজশাহী কলেজের নিউ হোস্টেলে জমায়েত হতে থাকে। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও ডা. এস. এম. এ গাফফার এর নেতৃত্বে মেডিক্যাল কলেজে এসে উপস্থিত হয়। উপস্থিত ছাত্ররা এস. এম. এ গাফফারের নেতৃত্বে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আহ্বায়ক হলেন এস. এম. এ গাফফার এবং যুগ্ম আহবায়ক হলেন রাজশাহী কলেজের গোলাম আরিফ টিপু এবং হাবিবুর রহমান (নাটোর)। এ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন রাতে রাজশাহী কলেজের নিউ হোস্টেল প্রাঙ্গণের সামনে একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৯৫২ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছাত্ররাও ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। ঢাকায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে জিটি স্কুলের ছাত্ররা একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এবং তাদের ডাকে দাদনচক্র, মনাকষা, দুর্লভপুর, বাবোরশিয়া, জগন্নাথপুর, পিয়ালমারী গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার কৃষকরা ২৪ ফেব্রুয়ারি সারাদিন হালচাষ বন্ধ রেখে ধর্মঘট পালন করে। ২৭ ফেব্রুয়ারি দাদনচক্র হাইস্কুল মাঠে সংগ্রাম কমিটির ডাকে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দাদনচক্র হাই মাদ্রাসার ছাত্র মালেক। এদিন পদ্মার চরাঞ্চলে নারায়ণপুরে এক বিরাট মিছিল হয় এবং সে মিছিলে নেতৃত্ব দেন নারায়ণপুর স্কুলের শিক্ষক সাইফুদ্দিন এবং ছাত্র বাহার। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর থানার হরিমোহনপুর হাইস্কুলের ছাত্ররাও ঢাকায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে মিছিল বের করে। শিবগঞ্জ হাইস্কুল এবং রানীহাট হাইস্কুলের ছাত্ররাও ক্লাসবর্জনসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করে।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

খুলনা

খুলনাতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ব্যাপক আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে খুলনায় ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভকরে। ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচিকে উপলক্ষ করে ২০ ফেব্রুয়ারি শহরের দেয়ালে দেয়ালে হাতের লেখা পোস্টার ছাপা হয়। ঢাকায় ছাত্র হত্যার সংবাদ স্থানীয় পুলিশ অফিসারের ওয়ারলেসের মাধ্যমে জানতে পেরে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে খুলনার আন্দোলনকারীরা। ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি আজাদ গ্রন্থালয়ে এক বৈঠকে ১১ সদস্যবিশিষ্ট 'ভাষা সংগ্রাম কমিটি' ঘোষিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন এমএ গফুর। ২৫ ফেব্রুয়ারি এ কমিটির উদ্যোগে খুলনায় হরতাল পালিত হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি দৌলতপুর বাজারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় নিরাপত্তা আইন বাতিল, নূরুল আমিনের পদত্যাগ এবং খুলনার এম এল এ-দের মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি পুনরায় মিউনিসিপ্যাল পার্কে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এমএ হাফিজ। এরপর থেকে খুলনার মুসলিম লীগে ভাঙন সৃষ্টি হয়। প্রগতিশীলদের নিকট থেকে সবুর খান ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে খুলনার একমাত্র প্রভাবশালী মুসলিম লীগার হন। তার গুণ্ডা বাহিনী ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জনতা তার গুন্ডা বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধে রাস্তায় নামলে মুসলিম লীগের গুন্ডামির অবসান ঘটে।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

সিলেট

সিলেটে চল্লিশের দশক থেকেই রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে ব্যাপক লেখালেখি হয়ে আসছিল। এক্ষেত্রে 'আল ইসলাম' পত্রিকাটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ (কেমুমাস) এর পক্ষে তৎপরতা শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ৯ নভেম্বর এ সংসদের একাদশ বর্ষের দ্বিতীয় সাহিত্য সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়। এতে শিক্ষাবিদ মুসলিম চৌধুরী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শীর্ষক দীর্ঘ এক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সভার পর থেকে সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পত্রিকাটিও ভাষার প্রশ্নে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর সিলেটের মাদ্রাসা হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বহুভাষাবিদ ড. সৈয়দ মুজতবা আলী উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৮ সালের ১১ জানুয়ারি সিলেটে পাকিস্তান সরকারের যানবাহন ও যোগাযোগমন্ত্রী আবদুর রব নিশতার এলে আবদুস সামাদ আজাদের (পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী) নেতৃত্বে একদল ছাত্র তার সাথে সাক্ষাৎ করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি এবং এর যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ১১ মার্চ সারাদেশের মতো সিলেটেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক 'নওবেলাল' পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৫০ সালে রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে সিলেট।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

ময়মনসিংহ

ভাষা শহিদ আবদুল জব্বারের শহর ময়মনসিংহে ভারত বিভাগের পরপরই রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সচেতনতা তৈরি হয়। ১৯৪৭সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলাভাষার পক্ষে স্থানীয় বিপিন পার্কে সম্মিলিত ছাত্র পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া। এছাড়া আলতাফউদ্দিন তালুকদার, পানু মজুমদার, কানু রায়, কানু মজুমদার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এ সভায় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার জোর দাবি জানানো হয়।

১৯৫২ সালে ঢাকার কর্মসূচিকে সামনে রেখে ময়মনসিংহবাসী প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। এদিন দুপুরে ঢাকায় ছাত্র হত্যার খবর এসে পৌছলে যাদের সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাদের বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। দলে দলে লোক তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দিন ভূইয়ার শ্যামাচরণ রোডের বাড়িতে সমবেত হতে থাকে। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি মহকুমা মুসলিম লীগের সভাপতি ফখরুদ্দীন আহমেদের সভাপতিত্বে টাউন হলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এতে ২৫৬ জন সদস্য ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

ময়মনসিংহ

আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষক সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসাইনকে সভাপতি এবং রফিকউদ্দিন ভূঁইয়াকে এ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২৪ ফেব্রুয়ারি শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রধান ব্যক্তিগণ এক আলোচনায় মিলিত হয়ে তিনদিন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন। মিছিল-সংগ্রাম উত্তাল হয়ে ওঠে ময়মনসিংহের প্রতিটি মহকুমা ও থানা। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

জামালপুর

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল আহ্বান করা হলে হরতাল সফল করার জন্য জামালপুর শহরে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হয়। এ উপলক্ষে ২০ ফেব্রুয়ারি বিশাল মিছিল বের করা হয়। পুলিশ আক্তারুজ্জামান মতি, দিদারুল আলম খুররম, সৈয়দ আবদুস সোবহান প্রমুখের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করে। জামালপুরের মেলান্দহ, উরামপুর, সরিষাবাড়ি থানায় আংশিকভাবে হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি জামালপুর মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। জামালপুরের ভাষা আন্দোলনে আশেক মাহমুদ কলেজের ভূমিকা খুবই উজ্জ্বল। এছাড়া জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর বালিকা বিদ্যালয় এবং সিংহজানি বালিকা বিদ্যালয়-এর ছাত্র-ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের মিছিল অংশ নেয়।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

যশোর

১৯৪৮ সালের শুরু থেকেই যশোরেও ভাষার প্রশ্নে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে এক শ্রেণির পত্র-পত্রিকা রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলে যশোরের ছাত্ররা এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে ছাত্র ফেডারেশন কর্মী আফসার আহমেদ সিদ্দিকী রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে 'মিল্লাত' পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করেন। এরপর তিনি 'ইত্তেহাদ' পত্রিকায়ও অনুরূপ চিঠি লেখেন।

১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আলমগীর সিদ্দিকীর বাসায় এক অনির্ধারিত বৈঠকে ২৮ ফেব্রুয়ারি মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের এলভি মিত্র হলে এক সভা করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রক্ষার শপথ নেওয়া হয়। এ সভায় একটি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ কমিটি ২ মার্চ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। ৭ মার্চ পুনরায় এ পরিষদের সভা বসে এবং ১১ মার্চ ছাত্র ধর্মঘটের কর্মসূচি সফলের বিষয়ে আলোচনা হয়। ৮ এবং ৯ মার্চ ধর্মঘটের সমর্থনে শহরে খণ্ড খণ্ড মিছিল হলে শহরের মানুষের মধ্যেও প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির অফিসে ডা. জীবন রতন ধরের সভাপতিত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে কিনা সে বিষয়ে আলোচনা চলে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির দুজন ব্যতীত কেউ ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু ছাত্ররা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ১৪৪ ধারা ভেঙে তারা মিছিল করবে। ১১ মার্চ সকাল ৭টায় শহরের স্কুল-কলেজে পিকেটিং শুরু হয়।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

যশোর

১১ মার্চ মসিউর রহমান রাজপথে মিছিলের সামনে এসে দাঁড়ালে সবাই অবাক হয়ে যায়, কেননা আগের দিন সভায় তিনি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন। পুলিশ ১৪ জনকে মিছিল থেকে আটক করে। সন্ধ্যায় আরও ২০ জনকে আটক করা হয়। এর প্রতিবাদে ১২ এবং ১৩ মার্চ শহরে হরতাল পালিত হয়। এ সময় পুলিশের পাশাপাশি অবাঙালিরাও আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হয়। তবে ১৮ মার্চের পর অবাঙালিরা আর শহরে প্রবেশ করতে পারেনি। ২৮ মার্চ আটককৃতদের মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৫২ সালে পুনরায় ভাষার প্রশ্নে আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঢাকায় সংঘটিত ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলগুলো সভা-সমাবেশ করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি শহরে পালিত হয় 'শহিদ দিবস'। এদিন প্রায় দেড় মাইল লম্বা মিছিলে অন্তত ১৫ হাজার লোক অংশ নেয়। মিছিল শেষে শহরের টাউন হল ময়দানে অধ্যাপক আবুল ওয়াহেদের সভাপতিত্বে এক বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

চাঁদপুর

২১ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরের জনতা ঢাকায় ছাত্রহত্যার সংবাদ জানতে পারেনি। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুর রব, বি এম কলিমুল্লাহ এবং অন্য একজন ছাত্র একটি রক্তমাখা শার্ট নিয়ে চাঁদপুর কলেজে এসে পৌঁছে এবং ঢাকায় ছাত্রহত্যার কাহিনি বর্ণনা করে। এতে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উত্তেজিত ছাত্ররা তাৎক্ষণিকভাবে কালো পতাকা উত্তোলন করে এবং কালোব্যাজ ধারণ করে। এরপর তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরে বের হয়। দেখাদেখি শহরের অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও বের হয়ে আসে। আদালত পাড়ার সামনে পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে। মিছিলটি শহর প্রদক্ষিণ শেষে অবশেষে চাঁদপুর কলেজে এসে শেষ হয়। সমবেত ছাত্রদের উপস্থিতিতে এখানে ছাত্রনেতা মোল্লা সিদ্দিকুর রহমানকে আহবায়ক করে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন চাঁদপুর কলেজ মাঠে মহকুমার প্রায় সকল স্কুল-কলেজ হতে মিছিল নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত হয়। মোল্লা সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিবাদ সমাবেশে প্রাদেশিক গভর্নর নূরুল আমিনের পদত্যাগ, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শোক দিবস ঘোষণা এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার দাবি জানানো হয়।

ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস

সাতক্ষীরা

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র হত্যার খবর সাতক্ষীরায় এসে পৌছলে সাতক্ষীরায় মিছিল হয়। পুলিশ ও মুসলিম লীগের গুন্ডারা এতে হামলা চালায়। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সাতক্ষীরার শামসুল হক গ্রেফতার হন। ১৯৫৩ সালে গ্রেফতার হন আনোয়ার আলী, সুশোভন ও কন্সী কিংকর।

এভাবে দেখা যাচ্ছে, তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রায় সর্বত্র ভাষা আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানে মুসলিম লীগ রাজনৈতিক দল হিসেবে এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ তখন জনপ্রিয়তার মোহে পড়ে বাংলার মানুষের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাকে বুঝতে পারেননি। যারাই মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছে তাদেরকেই কমিউনিস্ট, নাস্তিক, ইসলামের শত্রু, ভারতের দালাল, পাকিস্তানের শত্রু ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ভাষার প্রশ্নটি যে জাতিসত্তার অস্তিত্বের সাথে জড়িত ছিল একথাটি এদেশের আপামর জনতা বুঝতে পারলেও ক্ষমতার দম্ভে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করতে পারেননি। ফলে তারা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক ভূমিকা নেন। তাদের এ কূপমণ্ডুকতায় এক কালের প্রবল জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের রাজনৈতিক অপমৃত্যুই ঘটে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ১১ প্রথম শহিদ মিনার

টপিক ১১: প্রথম শহিদ মিনার

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রথম শহিদ মিনার

ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে যে শহিদ মিনারটি নির্মিত হয়, তা তাৎক্ষণিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তে হয়েছিল। ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে তখন সারা দেশের মানুষ এতটাই ক্ষুব্ধ ছিল যে, কিছু একটা করবার জন্য সবাই ছিল খুবই উদগ্রীব। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাস্তায় ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল করলে পুলিশের গুলিবর্ষণে কতিপয় অকুতোভয় ছাত্র নির্মমভাবে নিহত হন। এর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও সরকারের দমন-পীড়নে ঢাকার পরিবেশ ছিল খুবই থমথমে। এরই মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল কলেজের পাশে একটি ইটের মিনার নির্মাণ করে তাতে একটি কাগজ সেঁটে দেয়। এ মিনার নির্মাণের খবরটি রাতেই পত্রপত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হয়। শহিদ মিনারে সে কাগজটি সেঁটে দেয়া হয়েছিল তাতে লেখা ছিল শহিদ স্মৃতি স্তম্ভ। পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদ 'শহিদ বীরের স্মৃতিতে' শিরোনামে শহিদ মিনার নির্মাণের সংবাদ ছাপে।

প্রথম গান ও কবিতা

এই শহিদ মিনারটি ঢাকা মেডিকেল ছাত্র হোস্টেলের (ব্যারাক) ১২ নম্বর শেডের পূর্বপ্রান্তে কোণাকুণিভাবে এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যেন রাস্তা থেকে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। মিনারটি ইটের তৈরি। এটি ছিল ১০ ফুট উচু এবং ৬ ফুট চওড়া। এ মিনারের ডিজাইনার ছিলেন বদরুল আলম। মিনার নির্মাণ তদারকি করেন ইঞ্জিনিয়ার সরফুদ্দীন নামে পরিচিত জি.এম শরফুদ্দীন। মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের কাজ করার জন্য এনে রাখা ইট, বালি এবং পুরান ঢাকার পিয়ারু সর্দারের গুদাম থেকে সংগ্রহ করা সিমেন্ট দিয়ে মিনারটি নির্মাণ করা হয়। ভোর হওয়ার পর মিনারটিকে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এদিন (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে শহিদ শফিউরের পিতা মিনারটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু এদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল ঘেরাও করে মিনারটি ভেঙে ফেলে। এরপর ঢাকা কলেজেও একটি শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। সরকারি বাহিনী এটিও ভেঙে ফেলে।

প্রথম গান ও কবিতা

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শহিদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় এ ধরনের ইঙ্গিত ছিল। ফলে পূর্বের শহিদ মিনারের স্থলে একটি অস্থায়ী শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়। পরবর্তীতে একটি স্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অস্থায়ী শহিদ মিনারটি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্যকার নুরুল মোমেন।

স্থপতি হামিদুর রহমান সরকারি সিদ্ধান্তে ১৯৫৭ সালে স্থায়ী শহিদ মিনার নির্মাণ শুরু করেন। ভাস্কর নভেরা আহমেদের তত্ত্বাবধানে এবং হামিদুর রহমানের নকশা ও নির্দেশনায় এর নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। ১৯৬০ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে শহিদ মিনারটির নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৬৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ জনতার উপস্থিতিতে এই অসমাপ্ত শহিদ মিনারটিই ভাষা শহিদ আবুল বরকতের মা উদ্বোধন করেন।

প্রথম গান ও কবিতা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী এ শহিদ মিনারটি পুনরায় ধ্বংস করে দেয়। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হলে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি পুনরায় নতুন করে শহিদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করে। দ্রুততার সাথে নির্মাণের স্বার্থে হামিদুর রহমান প্রণীত নকশার কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৮৩ সালে শহিদ মিনারের আরও কিছু অংশ নির্মাণ করে বর্তমান রূপ দেওয়া হয়।

বর্তমানে শহিদ মিনারটি তিন স্তর বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে কিঞ্চিৎ অবনত মূল স্তম্ভ। দু'পাশে দুটি করে চারটি স্তম্ভ। বড় স্তম্ভটি মা এবং ছোট স্তম্ভগুলো সন্তানের প্রতীক। হামিদুর রহমানের মূল নকশায় একটি জাদুঘর ও একটি লাইব্রেরি ছিল যা বর্তমান কমপ্লেক্সে অনুপস্থিত। ২০১০ সালের ২৫ আগস্ট বাংলাদেশের হাইকোর্ট এক আদেশে শহিদ মিনার চত্বরে একটি জাদুঘর ও লাইব্রেরি নির্মাণের নির্দেশ জারি করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ১২ প্রথম গান ও কবিতা

টপিক ১২: প্রথম গান ও কবিতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রথম গান ও কবিতা

প্রথম গান (First Song)

একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনার পর আবদুল গাফফার চৌধুরী 'একুশ' নিয়ে প্রথম গান রচনা করেন। গানটি একটি খবরের কাগজের শেষের পাতায় গীতিকারের নামবিহীনভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে অবশ্য গীতিকার আবদুল গাফফার চৌধুরীর নাম ছাপা হয়। ১৯৫৪ সালে মরহুম হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একুশের সংকলনে' গানটি স্থান পায়। তৎকালীন সরকার সংকলনটি বাজেয়াপ্ত করে। এটি প্রথমে কবিতা হিসেবে লেখা হয়েছিল। তৎকালীন যুবলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক কবিতাটি আবদুল লতিফকে দিলে তিনি এতে সুরারোপ করেন। পরবর্তীতে লতিফ আতিকুল ইসলাম এতে প্রথম কণ্ঠ দেন। ঢাকা কলেজের কিছু ছাত্র যখন শহিদ মিনার স্থাপন করছিল তখন এই গানটি গাওয়ার চেষ্টা করে। এ অপরাধে তাদেরকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়।

প্রথম গান ও কবিতা

পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী আলতাফ মাহমুদ এ গানটিতে নতুন করে সুরারোপ করেন। বর্তমানে তার সুরটিই প্রাতিষ্ঠানিক সুর হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার পর এ গানের প্রচার আরও বেড়েছে। বর্তমানে গানটি সুইডিশ, জাপানি এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিবিসির শ্রোতা জরিপে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গানের তালিকায় এটি তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রত্যুষে বাংলার আনাচে-কানাচে সর্বত্র এই গান গেয়েই প্রভাত ফেরিতে বের হয় অগণিত মানুষ। নগ্ন পায়ে প্রাণের টানে ছুটে যায় শহিদ মিনারে। ফুলে ফুলে ভরে দেয় শহিদের বেদী, পরম শ্রদ্ধায়-পরম মমতায়।

প্রথম গান ও কবিতা

গানটি নিম্নরূপ:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া-এ ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি জাগো নাগিনীরা জাগো জাগো কালবৈশাখীরা শিশু হত্যার বিক্ষোভে আজ কাপুক বসুন্ধরা দেশের সোনার ছেলে খুন করে রুখে মানুষের দাবি দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি? না, না, না, না খুন রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ।। সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিল হেসে; পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেন এমন সময় ঝড় এলো এক ঝড় এলো খ্যাপা বুনো।। সেই আঁধারের পশুদের মুখ চেনা, তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভাইয়ের চরম ঘৃণা ওরা গুলি ছোড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে

প্রথম গান ও কবিতা

ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র-শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।।
তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহিদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাকে দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি।

প্রথম গান ও কবিতা

প্রথম কবিতা (First Poem)

ঢাকার রাজপথে মিছিলরত ছাত্রদের গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতার শিরোনাম ছিল- 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবির ভাষ্যমতে, এটি ছাপা হয়েছিল তবে তিনি সংরক্ষণ করতে পারেননি। পরবর্তীতে একজনের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে এই কবিতাটি পাওয়া যায়, যিনি এটি অভ্যাসবশত লিখে রেখেছিলেন। কবিতাটি অনেক বড় ছিল বলে জানা যায়। এর অংশবিশেষ নিচে উল্লেখ করা হলো:

> "এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার ঊর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায় যেখানে আগুনের ফুলকির মতো এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি। আজ আমি শোকে বিহ্বল নই আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল..."

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ১৩ বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

টপিক ১৩: বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আজ জাতীয়তার গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃতি পেয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বের প্রতিটি দেশ এখন ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের ভাষা সৈনিকদের স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ দিবসটিকে স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে মাতৃভাষার চিরন্তন আবেদনকে স্বীকার করে নিয়েছে বিশ্ববাসী।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

কানাডার ভ্যাংকুভারে বসবাসকারী দুই প্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের মাথায় প্রথম বিষয়টি আসে। তারা খেয়াল করেন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিবসকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করে বিশ্বব্যাপী তা উদযাপন করে থাকে। কিন্তু জাতিসংঘের কোন সংস্থা এখনও মাতৃভাষা দিবস বলে কোন দিবস পালন করছে না। অথচ মানুষের জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আর সেই মাতৃভাষার দাবি আদায় করতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষ এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাই তারা ১৯৯৮ সালের ৯ জানুয়ারি তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একটি পত্র লিখেন। সেই পত্রে তারা ১৯৫২ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি ও এর গুরুত্ব তুলে ধরে বাংলাদেশের ভাষা দিবস (শহিদ দিবস) ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার আবেদন জানান।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

সেসময় সেক্রেটারি জেনারেলের তথ্য কর্মচারী বিশিষ্ট সাহিত্যিক হাসান ফেরদৌসের নজরে আসে চিঠিটি। তিনি ঐ বছরের ২০ জানুয়ারি রফিকুল ইসলামকে চিঠি মারফত জানান যে, তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে এ ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন, তাহলে বিষয়টি আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এরপর জনাব রফিক তার বন্ধু আবদুস সালামকে সাথে নিয়ে 'Mother Language Lovers of the World' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনে তারা একজন জার্মানভাষী, একজন ইংরেজিভাষী, একজন ক্যান্টনিজভাষী এবং একজন কাচ্চিভাষীকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ সংগঠনের পক্ষ থেকে তারা আবারও একই রকম একটি পত্র জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবরে প্রেরণ করেন এবং এর একটি অনুলিপি জাতিসংঘের কানাডিয়ান রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফাউলারের কাছে পাঠান।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

একবছর পর তারা হাসান ফেরদৌসের কাছ থেকে একটি পত্র পান যাতে তাদেরকে ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের জোসেফ পডের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়। তারা জোসেফের সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি তাদের ইউনেস্কোর আনা মারিয়ার সাথে দেখা করার উপদেশ দেন। আনা মারিয়া তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তাদের পরামর্শ দেন যে তাদের প্রস্তাব ৫টি দেশ- কানাডা, ভারত, হাঙ্গেরি, ফিনল্যান্ড এবং বাংলাদেশ থেকে আসতে হবে। সে সময় বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এস এইচ কে সাদেক। রফিক এবং সালাম এরপর শিক্ষামন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং কূটনৈতিক পর্যায়ে কাজ করে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন। বিষয়টি তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গোচরীভূত করা হলে তিনি দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর এ প্রক্রিয়ার সাথে তৎকালীন শিক্ষাসচিব কাজী রকিবউদ্দিন, অধ্যাপক কফিল উদ্দিন, প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের তৎকালীন ডিরেক্টর মশিউর রহমান, ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোজাম্মেল আলী, কাউন্সিলর ইকতিয়ার চৌধুরী, ইউনেস্কোর সেক্রেটারি জেনারেলের শীর্ষ উপদেষ্টা তোজাম্মেল হক বিষয়টি নিয়ে কাজ করেন।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

অ্যাসফিল্ড পার্ক, সিডনি, অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

১৯৯৯ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ছিল প্রস্তাবটি ইউনেস্কোতে জমা দেবার শেষ দিন। তখনও প্রস্তাবটি এসে পৌঁছায়নি। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিষয়টি অবহিত করা হয়নি, কেননা তিনি তখন জাতীয় সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত। সংসদ অধিবেশন শেষ হতে হতে প্রস্তাবটি জমা দেয়ার অফিসিয়াল সময় শেষ হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করা হয়। তাকে সময় স্বল্পতার কথা জানিয়ে অনুরোধ করা হলো যেন তিনি আবেদনপত্রটি স্বাক্ষর করে ফ্যাক্সযোগে ইউনেস্কো সদরদপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। কালবিলম্ব না করে প্রধানমন্ত্রী আবেদনপত্রটি সই করে ফ্যাক্সযোগে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। তখন মাত্র আর এক ঘণ্টা বাকি ছিল যখন ইউনেস্কো সদর দপ্তরে আবেদনপত্রটি পৌঁছলো। ১৬ নভেম্বর প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর অধিবেশনে উত্থাপিত হওয়ার দিন ছিল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এদিন প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলো না। পরদিন ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ সাল। সভার শুরুতেই প্রস্তাবটি অধিবেশনে উত্থাপিত হলো।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিকায়ন

১৮৮টি দেশ এ প্রস্তাবে সাথে সাথেই সমর্থন দিলেন। কোনো দেশই এর বিরোধিতা করলো না। ফলে সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। ইউনেস্কোর (UNESCO) ঘোষণায় বলা হলো: "21 February is proclaimed International Mother Language Day through the world to commemorate the myrters who sacrificed their lives on this day in 1952." (১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাদের স্মরণে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বব্যাপী পালনের জন্য 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হলো)।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ১৪ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. কত তারিখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়?

ক. ১২ আগস্ট
খ. ১৩ আগস্ট
গ. ১৪ আগস্ট
ঘ. ১৫ আগস্ট

২. পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা কতজন?

ক. ৫৪
খ. ৫৬
গ. ৬৮
ঘ. ৬০

৩. পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষা ছিল কোনটি?

ক. উর্দু
খ. বাংলা
গ. ফার্সি
ঘ. হিন্দি

৪. পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসনে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা কেমন ছিল?

ক. সমৃদ্ধিশীল
খ. উন্নত
গ. প্রগতিশীল
ঘ. বঞ্চনাপূর্ণ

৫. যুক্তফ্রন্ট কেন শহিদ মিনার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়?

ক. শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে
খ. রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে
গ. দলীয় শক্তি বৃদ্ধিতে
ঘ. জনপ্রিয়তা অর্জন করতে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৬. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠনের নাম কী?

ক. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ খ. তমদ্দুন মজলিস

গ. সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ঘ. পূর্ব বাংলা ছাত্র পরিষদ

৭. তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

ক. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম খ. অধ্যাপক সফিউল্লাহ

গ. অধ্যাপক হাফিজুর রহমান ঘ. অধ্যাপক আবুল কাশেম

৮. তমদ্দুন মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল কোনটি?

ক. খ্যাতি অর্জন করা খ. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার রূপায়ণ

গ. উর্দুভাষাকে নস্যাৎ করা ঘ. বাংলা ভাষাকে নস্যাৎ করা

৯. ভাষা আন্দোলনের অন্যতম তাৎপর্য কোনটি?

ক. প্রতিপত্তি অর্জন খ. স্বায়ত্তশাসন

গ. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ঘ. সম্পদ অর্জন

১০. কত সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-গঠিত হয়?

ক. ১৯৪৯ খ. ১৯৫০

গ. ১৯৫১ ঘ. ১৯৫২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১১. কেন জনগণ জিন্নাহর বক্তব্যে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তোলেন?
ক. বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে খ. ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন করতে
গ. ফার্সি ভাষার চর্চা করতে ঘ. উর্দু ভাষাকে ধ্বংস করতে

১২. সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মূল ইশতেহার ছিল কোনটি?
ক. রাষ্ট্রভাষা বাংলা খ. রাষ্ট্রভাষা আরবি
গ. রাষ্ট্রভাষা উর্দু ঘ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

১৩. ভাষা আন্দোলনে ঢাকার বাইরের নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কে?
ক. সুফিয়া কামাল খ. নাদেরা বেগম
গ. মমতাজ বেগম ঘ. হালিমা খাতুন

১৪. ভাষা আন্দোলনে হামিদা খাতুনের অন্যতম কৃতিত্ব কোনটি?
ক. সম্পদ দান খ. অর্থদান
গ. অস্ত্র সরবরাহ ঘ. নারীদের ঐক্যবদ্ধকরণ

১৫. ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে জন্ম হয়-
ক. পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ খ. ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ
গ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ ঘ. আন্তর্জাতিকতাবাদ

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৪ – পাকিস্তান আমলে বাংলাঃ ভাষা আন্দোলন ও এর গতিপ্রকৃতি

টপিক – ১৫ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

"ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়।
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়।"[ঢা. বো., ম. বো., রা. বো., দি. বো.,, কু.বো., চ. বো., য. বো. ২০২১]

ক. পাকিস্তানের সংবিধান রচিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?

খ. তমদ্দুন মজলিস কী?

গ. উদ্দীপকের কবিতাটি তোমার পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত ঘটনা ছিল বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ- তোমার মতামত দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাবুল ও ইসমাইল ছুটিতে বাংলাদেশে এসে ১৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং বিশ্বের ইতিহাসের এ অসাধারণ ঘটনাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতি লাভের পরিকল্পনা করে। অস্ট্রেলিয়া ফিরে বাবুল তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বহুজাতিক সংগঠন গড়ে তোলে। এ সংগঠনের তৎপরতা ও সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গৃহীত হয়।
[দি. বো., কু. বো., চ. বো., য. বো., ব. বো. ২০২৩]

ক. পাকিস্তানের সংবিধান কবে রচিত হয়?

খ. পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান হয় কীভাবে?

গ. উদ্দীপকের বাবুল ও ইসমাইলের কর্মকান্ডের সাথে পাঠ্যপুস্তকের সাতচল্লিশ পরবর্তী কোন ঘটনার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত মহৎ প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখবে বলে কি বিশ্বাস করো? মতামত দাও।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

আজকাল ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলার সাথে ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে কথাবার্তা আদান-প্রদান করছে। ভাষার এ দুরবস্থা দেখে শিক্ষক মহোদয় দুঃখ করে শ্রেণিকক্ষে বললেন, এই বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে! সবার উচিত এই ভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখা।[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. ২০১৮]

ক. তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

খ. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফল কী হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের শিক্ষক মহোদয়ের বক্তব্যে কোন আন্দোলনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত আন্দোলন ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ প্রদর্শক- তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU